কবিরাজ

অভীক মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

আমাদের কথা

বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে অভীক মুখোপাধ্যায়ের নাম আজ মোটামুটি পরিচিত একটি নাম। না, লেখকের স্তুতি করার জন্য আমরা এই পাতাটিকে বেছে নিইনি,বরং আগামী কয়েকটি শব্দের মধ্যে দিয়ে আমরা এই বইটির লেখকের লেখনীর পরিচয় করাতে চাই তাদের সঙ্গে,যারা আজও কোন বই কেনার আগে বইটির প্রথম কয়েকটি পাতা উল্টে, বিষয়বস্তুর খানিকটা পড়ে নিয়ে, তারপর বইটিকে পছন্দ করে কেনার বিষয়টিতে মনস্থির করেন।

অভীক মুখোপাধ্যায়কে যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে অনুসরণ করেন তারা ওনাকে মূলতঃ রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবেই চেনেন। দেশ বিদেশের রাজনৈতিক বিষয়ের ওপর তার সোজাসাপটা বিশ্লেষণ বিভিন্ন সময়েই আমাদের কাছে মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে। অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তার অবাধ বিচরণ, অসুরা থেকে নিয়ে আওয়ার মুন হ্যাজ ব্লাড ক্লটস পর্যন্ত সব ঘরানাতেই তিনি সমান স্বচ্ছন্দ্য। অনুবাদক অভীককে পাঠককূল সাম্প্রতিক কালে নতুন ভাবে আবিস্কার করেছেন ঐতিহাসিক গল্প সংকলনের মাধ্যমেও।

ভৌতিক ঘরানার একক বইয়ের ক্ষেত্রে 'কবিরাজ' অভীক মুখোপাধ্যায়ের প্রথম প্রয়াস। আমরা যারা অভীককে লেখকের বাইরেও বন্ধু হিসেবে চিনি, তারা জানি যে নতুন বিষয়ে ঝুঁকি নিতে ও কতটা ভালোবাসে। একজন প্রতিষ্ঠিত অনুবাদক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকের পক্ষে সম্পূর্ণ অন্য ঘরানার লেখাতে নিজের কলমকে নিবেশ করা যে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ তা সম্পর্কে মোটামুটি আমরা ওয়াকিবহাল।

কিন্তু কবিরাজ পড়তে গিয়ে কখনওই আমাদের মনে হয়নি যে

লেখক এই ঘরানাতে স্বচ্ছন্দ্য নন। বরং পড়তে পড়তে বার বার মনে হয়েছে যে আগে লেখকের সাথে এই বিষয় নিয়ে আমাদের কাজ করা হয়নি কেন ! সহজ সরল ভাষা চয়ন, মাটির কাছাকাছি গল্প এবং এক অদ্ভুত মায়া ভরা লেখনীর সাথে কবিরাজের ছত্রে ছত্রে লুকিয়ে আছে চাপ চাপ অন্ধকার।

অভীকের বাকি লেখাগুলির মতন 'কবিরাজ'-ও পাঠক এবং সমালোচকদের সমান ভালোবাসা পাবে, প্রকাশনার তরফ থেকে আমরা এটুকুই প্রত্যাশা করি।

প্রথাগত পড়াশোনার পাট আমার অনেকদিনই চুকে-বুকে গিয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ায় বেশ ভালো ছিলাম। বোঝা যেত ব্রেন-বুদ্ধি শার্প আছে। কিন্তু আমার দ্বারা কিছু হল না জানেন, না প্রেম, না কোনও সরকারি চাকরি। নাম-কা-ওয়াস্তে একটা গ্র্যাজুয়েট হয়ে, বাপ-পিতেমোর ভিটেয় বসে অন্ন ধ্বংস করে চলেছিলাম। টাকাপয়সার অভাব কোনও কালেই ছিল না, তবুও কাঁহাতক আর বসে-বসে কাটানো যায়? পাড়ারই দুটো বাচ্চাকে টুইশন পড়াতে শুরু করেছিলাম। একটা ক্লাস সিক্স, অন্যটা সেভেনের। রোজ পড়াতাম। দুবেলা। সব সাবজেক্ট। তাদের বাপ-মা ফোনে ইন্টারনেট প্যাক রিচার্জ করার জন্যে শ-শ টাকা খরচা করতে পারে, কিন্তু ছেলেপড়ানো মাস্টারকে সামান্য ক'টা টাকার মাসমাইনেটা অবধি বুকে ধরে দিতে পারে না। সত্যি বলতে কী, টাকার দরকার আমার নেই, কিন্তু কোনও কাজ বিনামূল্যে করলে আর সম্মান থাকে না। ধুস শালা! ছেড়ে দিলাম পড়ানো। জীবনে আবার বেকারত্ব ফিরে এল, বসে থাকতেও ভালো লাগছিল না। টাইম কাটে না। দুপুরবেলা ঘুম আসে না, রাতটা জেগে কাটাই। কতক্ষণ আর ফেসবুকে মুখ গুঁজে থাকব? সেখানেও তো বন্ধুরা সব নিজের-নিজের জীবনের অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে ছবি আপলোড করে চলেছিল। আর আমি বেকারশ্রীর তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করে বসে ছিলাম।

এরই মধ্যে একদিন বাপন বাড়িতে এল। টোটোয় করে। বাপন আমার স্কুলবেলার বন্ধু। অনেকদিন যোগাযোগ ছিল না। বরাবরই একটু ন্যালাখ্যাপা ছিল। আন ইম্প্রেসিভ চেহারা।

চুলে সবসময় নারকোল তেল মেখে পেটো পেড়ে আঁচড়াত। পড়াশোনায় মাথা একদমই ছিল না। জীবনে কখনও কিছু হয়ে উঠবে এটা ও নিজেও ভাবেনি, আমরাও মনে করতাম না। এবারে দেখলাম ভোল একেবারে বদলে গেছে। আলাদা ঘ্যাম। ক্লিন শেভড। বডি স্প্রে'র সুগন্ধ ভুরভুর করছে। লিনেনের জামা, ডীপ ব্লু জিন্সের প্যান্ট। চোখে গগলস। মুখে মাস্ক। সব দামী। সব ব্র্যান্ডেড।

আমি বললাম, কী রে, তুই তো একদম বদলে গেছিস!

বাপন হাসল। আগের মতোই। সেম-টু-সেম আছে ছেলেটা। ও বলল, একটা আয়ুর্বেদিক কোম্পানিতে চাকরি করি, ভাই। সেলস দেখি। আগে তেমন চলত না। যা দিত, তাতে মাস গেলে সামান্য কিছুই হাতে থাকত। কিন্তু এই যে নোভেল করোনা এল, এরপর থেকে লোকে আয়ুর্বেদের দিকে ঝুঁকেছে। আয়ুর্বেদের কনসেপ্ট কী জানিস?

আমি বোকা-বোকা মুখচোখ করি— না, জানি না।

প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর। লোকে ব্যাপারটা খেয়েছে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। তাহলে করোনা হলেও তেমন এফেক্টেড হবে না। আর সেই থেকে আমাদের কোম্পানির বিভিন্ন রকমের ইমিউনিটি বুস্টারের রমরমা। আমি এখন সেলস সামলাতে হিমশিম খাচ্ছি। আগে শুধু বেঙ্গল দেখতাম, এখন হিল্লিদিল্লি করে বেড়াতে হচ্ছে।

কী হল হঠাৎ কে জানে? আমি বাপনের হাতটা চেপে ধরলাম। বললাম, শোন না, তোদের কোম্পানিতে আমার একটা কাজ হবে?

বাপন হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে পকেট থেকে একটা স্যানিটাইজার স্প্রে বের করে হাতে স্প্রে করে নিল। বোতলটা হাতে নাচিয়ে শান্তগলায় বলল, আমাদের কোম্পানির প্রোডাক্ট। হেভি কাটছে। এটার প্রোডাকশন ইউনিট দিল্লিতে। সবে শুরু

হয়েছে। একজন লোক লাগবে। ইউনিট সুপারভাইজার। একটা লোকদেখানো ইন্টারভিউতে অ্যাপিয়ার হতে হবে। সব বলা থাকবে। তোকেই বাছবে। থাকা-খাওয়া কোম্পানি দেবে। গোড়ায় হাজার পনেরো পাবি। মাস ছয়েক লেগে থাকলে আঠেরো হয়ে যাবে। করোনা আসার পরে এটা বিরাট খারাপ কিছু নয়, ভাই। করবি? দেখব কথা বলে?

ভেবে দেখলাম যে একবার লাক ট্রাই করে দেখি। জেনারেল কাস্ট। বয়েস যা দাঁড়িয়েছে তাতে সরকারি চাকরির আশা আর না-করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর আজকাল চাকরির পরীক্ষার ফলও বাজারে কিনতে পাওয়া যায় বলে গুজব রটে। তার চেয়ে এই কাজটা করেই দেখি নাহয়।

রাজি হয়ে গেলাম। বাপন বাঁকা হাসি হেসে বলল, আমায় ফার্স্ট মাসের স্যালারিটা পুরো দিতে হবে। মাইনে পেয়ে-টেয়ে নয়, অ্যাডভান্স দিবি। আজ দিলে আজই কথা বলে নেব। সামনের সপ্তায় ইন্টারভিউ। তুই অ্যাপিয়ার হয়ে যাবি।

আমি বললাম, ডান্।

ফোনেই টুকটুক করে টাকাটা ট্রান্সফার করে দিলাম। বাপন হাসল। আমি বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ। বাপন পালটা বলল, অ্যাকচুয়ালি দ্য প্লেজার ইজ মাইন।

আজকাল সবই ডিজিটাল। প্রেম থেকে পেমেন্ট সবকিছুই। তাই আর ক্যাশ তুলিনি। বাইরে গেলে অল্প কিছু জিনিস তো লাগবেই। নাহয় বাকী দরকার মতো ওখানেই কিনে নেওয়া যাবে। একটা ডাফল ব্যাগে জামাকাপড়, তোয়ালে, অন্তর্বাস, সার্টিফিকেটের ফাইল, সাবান-স্যানিটাইজার আর চিঁড়ে মুড়ির কৌটো ভরে শিয়ালদা থেকে রাজধানী ধরে নিলাম। চলো দিল্লি। তখনও জানি না যে থাকব কোথায়, খাব কী? আর দিল্লি— দিল্লিতে তো আগে কখনও যাইনি, তাই দিল্লি কী সেটাও বুঝিনি। যখন দিল্লিতে গিয়ে নামলাম, তখন বুঝলাম।

যেদিন সকালে নেমেছি, সেদিনই এগারোটায় ইন্টারভিউ।

গিয়ে দেখি বেশ বড় লাইন। এবং যে ঢুকছে রীতিমতো সময় নিয়ে তার ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে। দেড়টা নাগাদ আমি সুযোগ পেলাম। যা যা জিজ্ঞেস করার তা করল। শেষে একটা ফর্ম বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নিজের নাম-ঠিকানা, ফোন নাম্বার, ইমেইল আইডি এখানে লিখে দিন। পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।

আমি তো অবাক। বাপনের সেটিং? আমার টাকা? এসব তো লোকদেখানো ছিল? এ আবার নতুন কোন নকশা? বাধ্য হয়েই বললাম, স্যার, দিল্লিতে থাকার মতো কোনও ঠিকানা নেই। যা বলার আজই বলে দিন না, আমি বাইরে ওয়েট করছি নাহয়।

বাইরে ওয়েট করিনি। বেরোলাম এটিএম কার্ডটা ইউজ করে কিছু টাকা তুলব বলে। কিন্তু যেদিন কপাল খারাপ থাকে, সেদিন সবদিকেই ঝাড় ঝেতে হয়। এটিএম পয়েন্টে কার্ড গলালাম, বলে কিনা কার্ডের ভ্যালিডিটি এক্সপায়ার করে গেছে। ওমা, তাই তো। খেয়াল করিনি। এক সপ্তাহ আগেই নির্দিষ্ট তারিখ পেরিয়ে গেছে ভ্যালিডিটির। এবার কী হবে? বিধাতা এই কপালে আরও খারাপ কিছু লিখে থাকলে আমার দিল্লির পথে ভিক্ষে করতে হতো। ক্যাশ সঙ্গে না-এনে কী মূর্খের মতো কাজই না করেছিলাম আমি!

আমি আবার ইন্টারভিউয়ের ভেন্যুতে ফিরে এলাম। প্রায় সাড়ে তিনটে বাজে তখন। পেটে না-পড়েছে দানা, না-গিয়েছে পানি। অফিসে ঢুকে খোঁজ নিতে যাচ্ছি আর তখনই, হ্যাঁ ঠিক তখনই মনে হয় ভাগ্যদেবতা আমার কপাল ফিরিয়ে দিলেন। চাপরাশি ইন্টারভিউ রুম থেকে বেরিয়ে এসে একটা কাগজ নোটিশবোর্ডে সাঁটিয়ে দিল। রেজাল্ট? হ্যাঁ, হ্যাঁ রেজাল্ট। দৌড়ে গেলাম সেটার কাছে। বোকার মতো। ছোটার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। সব প্রার্থীই ফিরে গেছে। আমি একা বসেছিলাম। না কোনও জটলা, না কোনও হইচই।

একটাই তো পোস্ট। তার জন্যে একজনের নাম থাকবে।

ভালো করে দেখলাম। আরে, এ তো আমারই নাম। চোখ কচলে নিলাম। আবারও দেখলাম, আমারই নাম। না, কোনও ভুল নেই। হে ভগবান, তুমি কি তাহলে পরীক্ষা নিচ্ছিলে? এই যে নাম উঠল, এটা কি তাহলে আমার যোগ্যতায়? নাকি বাপনের সেটিং-এ?

মিনিট কুড়ির মধ্যে আমি হাতে পেয়ে গেলাম কোম্পানির লেটারহেডে টাইপ করা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। তারমানে গোড়ার পনেরো হাজার মাস ছয়েক পরে আঠেরো হাজার হবেই। সঙ্গে থাকা-খাওয়াটা ফ্রী। বাহ রে দিল্লি! খেল দেখালি। কে যেন বলেছিল হনুজ দিল্লি দুরস্ত্! মরগে যা, আমি তো দিল্লি জয় করেই ফেললাম।

ওপরওয়ালা যখন দেন, তখন ঝুলি ভরে দেন। আমার কোম্পানির পক্ষ থেকে একটা সুদৃশ হান্টার জীপ গাড়িতে চাপিয়ে সাইটে পৌঁছে দেওয়া হল। এটা মূল শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে। ততক্ষণে সন্ধে নেমে গেছে। ঘড়ি দেখলাম, সাতটা বাজে। যেখানে আমায় নামাল, সেটা একটা বিশাল বাগান। বাগানের একপ্রান্তে একটা প্রকাণ্ড বাড়ি।

***

বাড়ি শব্দটা এক্ষেত্রে একেবারে বেমানান। ওটাকে প্রাসাদ বলা উচিত। আমি নিশ্চিত যে ওটা মহল কিংবা হভেলি ছিল একটা সময়ে। একসময়ে ইমারত বুলন্দ্ ছিল। এখন বেশিরভাগ জায়গাতে রঙ চটে গেছে। খসে পড়ছে পলেস্তরা। কোম্পানি এটাকেই টেক ওভার করেছে তারমানে। ভালো করেছে। দেখভাল না-করলে খণ্ডহর হয়ে যেত। বাগান দিয়ে হেঁটে যাওয়ার জন্যে কাঁকড় বেছানো পথ। পথের দুদিকে কিছুটা অন্তর-অন্তর একটা করে ল্যাম্প পোস্ট। মোট আটটা। তার মধ্যে মাত্র দুটোতে আলো জ্বলছে। আলো বলতে উলঙ্গ

বাল্ব। লালচে আলো। এদিকে মনে হয় ভোল্টেজ ভালো নয়।

ওই আলোতেই চোখে পড়ল হভেলির ছাদের জাফরি কাটা রেলিং। একটা ডানাভাঙা পরি হভেলির মাথায় তখনো ওড়ার চেষ্টা করে চলেছে। ওটা মনে হল লাল পাথরের। অন্ধকারে কালো দেখাচ্ছিল। হভেলির গায়ে মার্বেল বসানো। পাথরগুলো অনেক কিছুর সাক্ষী মনে হয়।

বাগানটা অনেকটা জায়গা জুড়ে। এই ভর সন্ধেতেও দুপুরের রোদের ভাপ উঠছে। দিল্লির গরম সবার জানা। বাগিচা জুড়ে অযত্নের চিহ্ন সুস্পষ্ট। ভালো করে তাকাতে বুঝলাম একসময়ে বেশ কয়েকটা চারচৌকো প্লটে ভাগ করে নিয়ে আলাদা-আলাদা গাছকে লালনপালন করা হতো। পোস্ট দুখানার আলো বাগানটাকে আলোকিত করে তোলার পরিবর্তে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছে অনেক বেশি। দেখলে মনে হয় আলোআঁধারির ছিন্নভিন্ন পোশাক।

একটা গন্ধ আসছিল। মিষ্টি। ঝিমধরা। আমি হভেলির দিকে যত এগোচ্ছিলাম, বাতাস ভারী হয়ে উঠছিল ওই সুগন্ধে।

হভেলির ডানদিকে একটা অস্থায়ী এক্সটেনশন নজরে পড়ল। প্লাই গোছের কিছু দিয়ে দেওয়াল খাড়া করে মাথায় টিনের শেড চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। দরজার মাথায় একটা ষাট ওয়াটের বাল্ব জন্ডিস রুগীর মতো ম্যাড়ম্যাড়ে আলো ছড়াচ্ছে। বুঝলাম ওটাই সাইটের চৌকিদার রামভরোসের থাকার জায়গা। এবং সেই সঙ্গে আমারও। আমাকে ওঁর কথা বলে দেওয়া হয়েছিল অফিস থেকেই। রামভরোসে সাইটে পাহারা দেওয়ার পাশাপাশি আমার রাতের খাবারটাও বানিয়ে দেবেন।

আমাকে নামিয়ে দিয়ে হান্টার জীপটা যখন ফিরে যাচ্ছে, তখন তার পিছু-পিছু ধুলোর মেঘ দেখে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। আমি দিল্লি শহরে কাজ ভেবে এসেছিলাম, কিন্তু এ যে শহর থেকে আরও অনেক দূরে। মনে হয় কটা দিন নিরালাতেই কাটাতে হবে। প্লান্ট ঠিকঠাক চালু হতে,

মুখর হয়ে উঠতে সময় লাগবে। দরজা খোলা পেয়ে আমি মেকশিফট আস্তানায় ঢুকে পড়লাম। মেঝেতে চাটাই বিছোনো। রামভরোসেকে আশেপাশে কোথাও দেখলাম না। তবে এটুকু বুঝলাম যে দরজা খোলা রেখে যখন গেছে, তখন কাছেপিঠেই রয়েছে। এসে যাবে। সারাদিনের হয়রানির শেষে এবার পেটের খিদেটা চাগাড় দিয়ে উঠেছিল, কিন্তু রামভরোসে না-এলে উপায় নেই।

ব্যাটা গেছে তো গেছে ফেরার নামই নেই। ন'টা বেজে গেল। পেটে তখন বত্রিশটা ছুঁচোয় ডন মারছে। খাওয়ার জন্যে এত নাকাল আমি জীবনে কোনওদিন হইনি। শুয়ে থাকতেও পারছিলাম না আর। মন উচাটন— বাইরের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে বসে রয়েছি, এই বোধহয় রামভরোসে এল। কিন্তু নাহ্।

ঘড়িতে যখন এগারোটা বাজল, তখনও রামভরোসের দেখা নেই। আমি হাঁ করে চাঁদ দেখছিলাম। কী সুন্দর চাঁদটা! কিন্তু আমার দেহমনে তখন ক্ষুধার রাজ্য। বুঝলাম যে কেন কবি চাঁদটাকে ঝলসানো রুটির সাথে তুলনা করেছিলেন। বাগান তখন ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। শ্বেত। শুভ্র। রেশম-জালের মতোই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে চন্দ্রাতপের প্রেমে পড়ার প্ররোচনা। ওই বিশাল হভেলির পাশে একলা বসে থাকাটাও তো চাট্টিখানি কথা নয়। মনের গহীন কোণ থেকে একটা অজানা ভয় উঁকি মারে। আমি ভয়টাকে প্রশ্রয় দিই না। জ্যোৎস্না আমায় ডাক দিয়েছে, আয় রে ছুটে আয়। হভেলিটা ঘুরে দেখার ইচ্ছে জাগল। খিদে সহ্য করার জন্য তাছাড়া আর কোনও উপায় আমার মাথায় এল না। কেবিন থেকে বেরিয়ে আমি খণ্ডহর হতে চলা হভেলির দিকে এগোলাম।

লাল পাথরে তৈরি পরিটার দিকে চোখ রেখে চলছিলাম। এখন কিন্তু আর কালো লাগছে না। চাঁদের আলোয় কী অপূর্ব সুন্দর! পরিটি নগ্নিকা। অত নীচে থেকেও স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম তাঁর দেহের প্রতিটি খাঁজ। স্তন, নিতম্ব মায় পদ্মপাপড়ির

মতো ভগদেশও। আমার গতি তখন মন্থর। এক পা, এক পা করে এগোচ্ছিলাম। এমন সময় থমকে দাঁড়ালাম। বলা ভালো যে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম। হভেলির একেবারে নীচের তলার বারান্দায় থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন একজন নওজোয়ান। গায়ের রঙ সাদা ধবধব করছে। চওড়া উন্মুক্ত বুক। পৈতে ধারণ করেছেন— ব্রাহ্মণ। হিন্দিতে পৈতেকে জনেউ বলে। পরনে শুধু একটি পীতাভ ধুতি। আর জনেউধারীর বুকে লেপটে আছে অপ্সরার মতো সুন্দরী এক রমণী। তার দুই হাত ধরে আছে ব্রাহ্মণের গর্দানটাকে। চিমটি কাটলাম নিজেকে— এ আমি কী দেখছি! যা দেখছিলাম, তা বাস্তবে ঘটছিল। মেয়েটির পোশাক বলতে গাঢ় সবুজ ওড়না সমেত চুনোটের চুড়িদার শালোয়ার। সাদা রঙের। ধবল জ্যোৎস্নার ধারার মধ্যে বান এসেছিল যেন। দোপট্টাখানা মাথা ঢেকে রেখেছিল। আব্রু রক্ষার সহজ উপায়। ওড়নার একটা প্রান্ত বাঁ-কাঁধ বেয়ে ঝুলছিল। প্রথমেই ভাবলাম এ কী ব্যাভিচার নাকি অভিসার? লোকালয় থেকে দূরে এই নির্জন জায়গায় দুই প্রেমী একে অন্যের প্রেমে মশগুল হয়ে রয়েছে। এগোবো কি এগোবো-না সেটা নিয়ে দোনোমোনো করছিলাম। স্থির করলাম ফিরে যাওয়াই শ্রেয়। ফিরেই আসছিলাম, এমন সময়ে মেয়েটি নিজের প্রিয়তমের বুক থেকে ছিটকে দূরে সরে গিয়ে ওড়না দিয়ে মাথাটাকে ঢেকে নিল। আমি স্পষ্ট বুঝলাম ওরা আমাকে দেখে ফেলেছে। যুবক আমাকে উদ্দেশ্য করে হাঁক লাগাল— 'আ জাইয়ে! তকল্লুফ কি কোই জরুরত নহিঁ।'

আমিও তখন ঘাবড়ে গেছি। একবার থমকে দাঁড়িয়ে ওদের দিকেই এগোলাম। এই নির্জন বাড়িতে একা থাকার থেকে দুজনে, না দুজনে নয় তিনজনে থাকা ঢের ভালো। খিদেতে তো এমনিতেই ঘুম আসার কথা নয়, রাত যখন জেগেই কাটাতে হবে, তখন নাহয় দুটো গল্পই করা যাক।

'কিঁউ বন্নো? মেহমান মোহতরম কে লিয়ে কুছ ইন্তেজাম